সেইসব ‘বীরাঙ্গনা’ ও তাদের ‘নাপাক’ শিশুরা

ফারুক ওয়াসিফ

এক. পাঠক, ’৭১-এর নারীর প্রসঙ্গ বলার মতো পীড়ন আর নাই। ’৭১ সালের যোদ্ধা নারী, নির্যাতিত নারী, আক্রান্ত নারীদের কথা যতই ভাবি, ততই বিষপানের বেদনা হয়। কে পারে চিত্ত অচঞ্চল রেখে নির্বিকার সাংবাদিক বা ঐতিহাসিকের মতো একাত্তরের সব থেকে বিস্ফোরক প্রসঙ্গটি নিয়ে নাড়াচাড়া করতে? আজ এতদিন পর পাক হানাদারদের বিরুদ্ধে ঘৃণার অগ্ন্যুৎপাত ঘটানো বরং সহজ; কিন্তু কঠিন সেসব নারী ও শিশুদের কথা বলা; স্বাধীনতার দাম যারা সবচেয়ে বেশি দিয়েছিল এবং এখনও দিচ্ছে। গণহত্যায় বা লড়াইয়ের ময়দানে যে নারীরা মারা গিয়েছে তারা বরং মরে পরিত্রাণ পেয়েছে আজীবন দোজখবাস থেকে। কিন্তু যারা বেঁচে আছে তাদের যন্ত্রণার হুতাশন আজো নেভেনি– কোনোদিন নিভবে না। এমন এক স্বাধীন দেশের জন্য তারা সর্বস্ব দিয়েছে, যে দেশ তাদের স্বীকার করেনি। পাকিস্তানি সৈন্য এবং তাদের দেশীয় দোসররা লাখ লাখ নারীর জীবনকে তছনছ করে পুড়িয়ে খাক করে দিয়েছে, আর স্বাধীন বাংলাদেশ তাদের সেই পোড়া ঘায়ে লবণ দেওয়ার উপযুক্ত কাজ করেছে। আমি জানি না, কোনটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ: সমব্যথা জানানো, না যে প্রক্রিয়ায় তাদেরকে ‘জ্যান্ত-মরা’ করা হয়েছে, তা?

সরকারি হিসাবে আড়াই লাখ এবং কোনো কোনো গবেষকের মতে প্রায় চার লাখ নারী একাত্তরে ধর্ষিত হয়েছিলেন। ৮ থেকে ৮৭ বছর বয়সের। একবার নয়, একদিনের জন্য নয়– বারবার অনেক দিন ধরে অমানবিক পরিবেশে আটক থেকে। আত্মহত্যা করারও উপায় ছিল না। মাথার চুল কেটে দেওয়া হয়েছিল, যাতে সিলিংয়ে ঝুলে পড়তে না পারে। 'ধর্ষণ' শব্দটি তাদের জন্য যথেষ্ট নয়। তাদের নির্যাতনকে চিহ্নিত করার মতো শব্দ আমার জানা নাই– পুরুষপ্রধান ভাষায় তা সম্ভব কি-না জানি না।
মার্চ থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত কারো মতে ১০ লাখ কারো মতে ৩০ লাখ বাঙালি গণহত্যার শিকার হয়েছিলেন। বেশি সংখ্যাটাই যদি ধরি এবং এর কমপক্ষে ২০ শতাংশ যদি নারী হন, তাহলেও ৬ লাখ নারী নিহত হয়েছিলেন। ৪ লাখ চরম নির্যাতিত (এদের অনেকেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিলেন) আর ৬ লাখ নিহত নারীর পরিণতি আমাদের জাতীয় মানসে কোন দাগ রেখে গেল? এই দশ লাখ নারী কেন মুক্তিযোদ্ধার স্বীকৃতি পাবে না। জাতীয় মুক্তির যুদ্ধে কি কেবলই পুরুষেরই প্রবেশাধিকার? ১৯৭৩ সালে ৬৭৬ জন মুক্তিযোদ্ধাকে নানা উপাধিতে ভূষিত করা হয়। এর মধ্যে মাত্র দু'জন ছিলেন নারী। তাদেরই একজন কুড়িগ্রামের দরিদ্র নারী তারামন বিবি। তিনি তার 'বীরপ্রতীক' উপাধি পাওয়ার খবর জানতে পারেন ঘটনার ২৪ বছর পর।

ধর্ষণের পরও বেঁচে থাকা নারীদের মধ্যে ২৫ হাজার জন গর্ভধারন করেছিলেন বলে জানা যায় (ব্রাউমিলার, ১৯৭৫ : ৮৪)। ওয়ার ক্রাইমস ফ্যাক্টস ফাইন্ডিংস কমিটির পুরোধা এমএ হাসান দাবি করেন, 'এ ধরনের নারীর সংখ্যা ছিল কমপক্ষে ৮৮ হাজার ২ শ'। '৭২ সালের মার্চ পর্যন্ত ১ লাখ ৬২ হাজার ধর্ষিত নারী এবং আরো ১ লাখ ৩১ হাজার হিন্দু নারী স্রেফ গায়েব হয়ে গিয়েছিল। তারা বিলীন হয়ে গিয়েছিল বিশাল জনসমুদ্রে।' এদের মধ্যে ৫ হাজার জনের গর্ভপাত সরকারিভাবে ঘটানো হয়েছিল বলে জানান আন্তর্জাতিক প্লানড ফাদারহুড প্রতিষ্ঠানের ড. জিওফ্রে ডেভিস। যুদ্ধের পরপরই তিনি এসব মা ও তাদের শিশুদের সহায়তা করার জন্য বাংলাদেশে আসেন। ১৯৭২ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি তার কাজের ওপর একটি বিস্তারিত প্রতিবেদন তৎকালীন দৈনিক বাংলায় প্রকাশিত হয়েছিল। তার মতে, সরকার উদ্যোগ নেওয়ার আগেই ১ লাখ ৫০ হাজার থেকে ১ লাখ ৭০ হাজার নারীর ভ্রূণ স্থানীয় দাই, ক্লিনিকসহ যার পরিবার যেভাবে পেরেছে সেভাবে নষ্ট করেছে। এত কিছুর পরও যারা জন্মাতে পেরেছিল তাদের ভাগাড়ে নিক্ষেপ করা, ভিখারির কাছে বিক্রি করাসহ বিদেশে দত্তক দেওয়ার জন্য পাঠানো হয়। মাদার তেরেসা সে সময় এ কাজে সহযোগিতা করতে ঢাকা আসেন। তার প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে অনেক শিশুকে কানাডা, নরওয়ে প্রভৃতি স্থানে

পাঠানো হয়। এসব শিশুর নাম দেওয়া হয়েছে ‘যুদ্ধশিশু’। আজ তারা কী করছে, কী করছে তাদের হতভাগ্য মায়েরা? ‘কে আর ইতিহাস খুঁড়ে বেদনা জাগাতে ভালোবাসে?’ হয়তো এ কারণেই যৌন নির্যাতন সম্পর্কে তদন্তে যাওয়ার বদলে বিষয়টিকেই নীরবতা দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়েছে। এসব নারীর মানমর্যাদার কথা চিন্তা করে, নষ্ট করে দেওয়া হয় তাদের নামধাম, নথিপত্র। এভাবেই জাতীয় অহম রক্ষার জন্য নারী মুক্তিযোদ্ধাদের স্মৃতি ইতিহাস থেকেও মুছে ফেলার চেষ্টা করা হয়। নির্যাতিত বা শহীদ নারীদের স্মরণে স্মৃতিসৌধ তো দূরের কথা একটা স্মারক পর্যন্ত নির্মিত হয়নি। স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে, জাতির ধারণা কি কেবলই পুরুষালি, নারীর অস্তিত্ব ও অবদানের স্বীকৃতি সেখানে কোথায়?

পাকিস্তানে আটক অবস্থা থেকে মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক শেখ মুজিবুর রহমান দেশে ফেরেন ১৯৭২ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি। সেদিনই সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে বিশাল জনসভায় তিনি বলেন, ‘দুই লাখ মা-বোন! এদের আমি কোথায় কী করব?’ ১৯৭২ সালের ২৬ জানুয়ারি তিনি বলেন, ‘তোমরা বীরাঙ্গনা, তোমরা আমাদের মা’ (বাংলার বাণী, ২৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭২)। ‘যুদ্ধশিশু’ এবং তাদের মা’দের একটা সুব্যবস্থা করার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নীলিমা ইব্রাহিম অনেক খেটেছিলেন। এদের ভাগ্যে কী হবে, তা জানতে তিনি শেখ মুজিবের সঙ্গে দেখা করেন। তিনি তাকে বলেন, ‘না আপা। আপনি দয়া করে পিতৃপরিচয়হীন শিশুদের বাইরে (বিদেশে) পাঠিয়ে দেন। তাদের সম্মানের সঙ্গে মানুষের মতো বড় হতে দিতে হবে। তাছাড়া– আমি এসব নষ্ট রক্ত দেশে রাখতে চাই না।’ (ইব্রাহিম, ১৯৯৮ : ১৮)। এটি কেবল রাষ্ট্রের স্থপতি এক মহানায়কের সংকট নয়, এটা ছিল জাতীয় সংকট। গোটা জাতির হৃদয়ে রক্তক্ষরণ হচ্ছিল, গ্লানি জমছিল। তাই তারা যা ভালো মনে করেছেন, করেছেন। সব পর্যবেক্ষকই স্বীকার করেন, স্বাধীনতা-পরবর্তী সরকার এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো সম্ভব সবকিছুই করার চেষ্টা করেছেন। সরকারের তরফ থেকে এসব নির্যাতিত নারীকে বিয়ে দেওয়ার চেষ্ট হয়। তারা ভেবেছেন সেটাই নারী জীবনের একমাত্র গন্তব্য। অল্প ক’জন মুক্তিযোদ্ধা এগিয়ে আসেন, তবে মোটা যৌতুক চান। যৌতুকের লিস্টির মধ্যে লাল জাপানি গাড়ি থেকে অপ্রকাশিত কবিতার বই প্রকাশ করা পর্যন্ত ছিল। তাদের যুক্তি: এদের অভিভাবক হিসাবে যৌতুক মেটানোর দায়িত্ব সরকারের। শেখ মুজিব বলেছিলেন, ‘আমি ওদের বাবা।’ ইতিহাসের দায় কি এতেই শোধ হয়? ড. ডেভিস মন্তব্য করেন, ‘না, কেউই এটা নিয়ে কথা বলতে চায়নি।... পুরুষেরা এ নিয়ে একদম কথা বলতে রাজি নয়। তাদের চোখে এসব নারী নষ্ট হয়ে গেছে। হয়তো তাদের মরে

যাওয়াই ভালো ছিল এবং পুরুষরা সত্যিই তাদের মেরেও ফেলেছিল। আমি বিশ্বাস করতে পারিনি। পশ্চিমা সমাজে এরকমটা এত অপরিচিত! এত অপিরিচিত!' (সাক্ষাৎকার, বিনা ডি কস্টা, ২০০২)।

জাতিরাষ্ট্রের মর্যাদা ও পারবিারিক পবিত্রততার পুরুষালী মূল্যবোধ একজোট হয়ে কীভাবে নারী মুক্তিযোদ্ধার অস্তিত্বের মর্যাদা ও যন্ত্রণাকে 'বীরাঙ্গনা' নামের আড়ালে ঢেকে দেয় এ ঘটনা তার প্রমাণ। পরিবারের পিতা বা বড় ভাই আর 'জাতির পিতা' এখানে এক স্বরে কথা বলেন। স্বাধীনতা যুদ্ধের পুরুষালি ইতিহাস নারীকে – হোক তারা মুক্তিযোদ্ধা– কেবল সতীত্বের তকমা আঁটা চেহারাতেই দেখতে চেয়েছে। নারী যুদ্ধও করবে, পুরুষের রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জনের বলিও হতে পারবে কিন্তু কোনোভাবেই পুরুষের পরিবারের সদস্য হওয়ার অনুপযুক্তা হতে পারবে না– তাকে শুদ্ধ থাকতেই হবে।

দুই. বড় মাছ যেমন ছোট মাছকে খায়, তেমনি বড় ইতিহাস ছোট ইতিহাসকে লোপাট করে। বড় ইতিহাস মানে জাতীয় ইতিহাস, সেখানে নায়ক-মহানায়ক আছে, বীর আছে। তারা জাতি গঠনের ইঞ্জিনিয়ার ও স্থপতি। তাদের অনুসারীদের ভাবোচ্ছ্বাসে ইতিহাসের ছোট ছোট কারিগরের ভূমিকা ঢাকা পড়ে যায়। ইতিহাসেও মাৎস্যন্যায় আছে। আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে এ সত্য বিরল নয়।

যে কোনো মহাকাব্যিক জাতীয় যুদ্ধের মতো মুক্তিযুদ্ধও একটি মাত্র উপাখ্যান নয়। মুক্তির যুদ্ধ মানে একইসঙ্গে বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষের সম্মিলিত ও ব্যক্তিগত যুদ্ধ। সম্মিলিত যুদ্ধের ইতিহাসও তেমন সহি কিছু নয়, তবু তা আছে। কিন্তু এই সাড়ে সাত কোটি মানুষের জীবনে যে সাড়ে সাত কোটির অনেক গুণ বেশি ঘটনা ঘটেছিল তার হদিস কোথায়? কোথায় তাদের অর্ধাঙ্গিনীদের ইতিহাস? সেসবও কি জাতীয় ইতিহাসের অংশ নয়? কেবল অংশই নয়, নারীর মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ছাড়া মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস কেবল বিকৃতই নয়, অসত্য। যদিও এ বিকৃতি নিয়ে আহাজারি করার লোক কম, প্রতিবাদের প্রশ্ন তো রইলই।

পুরুষের মুক্তির যুদ্ধ তাই মুক্তিযুদ্ধের একমাত্র কাহিনী নয়। যুদ্ধটা নারীরও, বরং তারই বেশি। নারীর যুদ্ধে কোনো ফাঁক ছিল না। একজন নারীকে পাওয়া যাবে না যে জাতির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল। সেদিন বাঙালি সত্তা যেমন আক্রান্ত হয়েছিল তেমনি নারীসত্তাকে দলিত ও ধ্বংস করাটাও শত্রুর লক্ষ্য ছিল। নারী তাই দু'ভাবে আক্রান্ত হয়েছিল– প্রথমত, নারী হিসাবে; দ্বিতীয়ত, বাঙালি মাতা হিসাবে– বাঙালিদের জন্মদায়িনী হিসাবে। '৭১-এ কোনো নারী বোধ করেনি যে, সে আলাদাভাবে আক্রান্ত। ব্যক্তিগত বোধ সে রকম পরিস্থিতিতে লোপ পায়। তাদের অনেকে যুদ্ধেও যোগ দিয়েছিল, প্রমাণ

রেখেছিল স্বাধীনতার স্পৃহা ও দেশপ্রেমের। সবচয়ে বড় যা; তারাই তখন সমাজ-সংসারকে টিকিয়ে রেখেছিল। শাহীন আফরোজের এক গবেষণায় দেখা যাচ্ছে, মেয়েরা তাদের চোখের সামনে স্বজনদের খুন হতে দেখে প্রতিশোধ স্পৃহায় যুদ্ধে নেমেছিল। অথচ আজো মুক্তিযোদ্ধা, দেশপ্রেমিকের প্রতিচ্ছবি কেবলই পুরুষেরই দখলে। জাতীয়তাবাদ কি তবে পুরুষের মতাদর্শ?

তিন. তিন ধরনের তিন নারীর তিনরকম প্রতিরোধ ও বিপর্যয়ের কাহিনী দিয়ে এই খসড়া-কহন শেষ করব।

১. মধুমিতার কাহিনী (ছদ্মনাম) "তাদের কাজ হয়ে যাবার পর তারা বাড়িতে আগুন লাগিয়ে চলে গেল। কিন্তু আমি তো আমার ভাইটিকে মরতে দিতে পারি না। তাই অসহ্য ব্যথা সত্ত্বেও নিজেকে কোনো মতে তুলে ভাইকে দরজা ভাঙায় সাহায্য করলাম। তা করতে গিয়ে মারাত্মকভাবে পুড়ে গেলাম। সেই রাতে লুকিয়ে থাকলাম বাড়ির পেছনের পুকুরটাতে। পরদিন ভোরে যখন পুকুর থেকে উঠলাম, আমার গায়ের মাংস খাবলা খাবলা করে খসে পড়তে লাগল। দু'একটা টুকরা ছাড়া গায়ে কোনো কাপড় ছিল না। এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখলাম, গাঁয়ের কিছু লোক ভোরের নামাজ পড়ে ফিরছে। আমাকে দেখে তারা মজা পেয়ে হৈহৈ করে উঠল। আমি তাদের বলার চেষ্টা করলাম, 'আমি বেশ্যা নই, ওমুক আমার বাবা, আমাকে সাহায্য করুন।' কিন্তু তারা চলে গেল। সেদিন থেকে আমি জীবন্ত মরা। আমার শরীরে যন্ত্রণা। আজ আমার কোনো শিক্ষা কোনো স্থান কোনো মর্যাদা নেই। ভাইয়ের জন্য আমার জীবন, সম্মান সবকিছুই বিসর্জন দিয়েছি। অথচ আমি এখন তার চাকরের থেকে বেশি কিছু না। এই-ই বাংলাদেশে মেয়েদের কপাল।" (সাইকিয়া, ২৮৬, হিস্টরি ওয়ার্কসপ জার্নাল)

২: এ গল্পটি বলেছে বিমান (ছদ্মনাম)। "এপ্রিলের তিন তারিখে পাকিস্তানি বাহিনী শহরে ঢোকে। রেলওয়ে কলোনির বিহারিরা তাদের দেখে বুক ফুলিয়ে চলাফেরা শুরু করে। দেখে আমাদের মনে রাগ জাগল। আমি এবং আমার পাঁচ বন্ধু মিলে ঠিক করলাম, তাদের একটা শাস্তি পাওনা হয়েছে। আমরা এক প্রতিবেশী বিহারির বাড়িতে গেলাম। তাকে আমি 'চাচা' ডাকতাম। তার মেয়েটি আমার বোনের বান্ধবী। সে আমাকে 'ভাই' বলত। কিন্তু সেদিন সব মানবিক বন্ধন ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল।

আমরা জোর করে ওই বাড়িতে ঢুকে পড়ি... মেয়েটিকে ধরি এবং তার কাপড়-চোপড় খুলে ফেলি। কিন্তু সে আমাদের হাত থেকে ছুটে পালায়। আমরাও পিছু নিই। তার পেছনে ছোটা লোকের সংখ্যা বাড়তে থাকে। আমার মনে কেবল তখন একটাই চিন্তা, আমি এই মেয়েটিকে ধর্ষণ এবং বিনাশ করব, ওরা আমাদের শত্রু।... সেই মুহূর্তেই

বুঝলাম আমার ভেতরে শয়তান জন্ম নিচ্ছে। আমার কাছে মানুষ মারার অস্ত্র আছে, আমার প্রশিক্ষণ আছে। ট্রেনিং দিয়ে আমাকে সাপের মতো ঠাণ্ডা বানানো হয়েছে। যুদ্ধের সময় আমি ভেবেছি, ' এ আমার কী হলো'? এখন এতদিন পর এ নিয়ে আমি অনেক ভেবেছি, অনেক অপরাধ আমার। জাতীয়তাবাদ খারাপ জিনিস।'' (সাইকিয়া, ২৮৬, হিস্টরি ওয়ার্কসপ জার্নাল) এটি নিশ্চয়ই একজন মুক্তিযোদ্ধার আদর্শ চরিত্র নয়। আবার এমন ঘটনার অস্তিত্ব একেবারেই কম নয়। কথা হচ্ছে, যারা এভাবে বিচ্যুত হয়েছিলেন তাদের মুখ বন্ধ করে রেখে তাদেরও কি নিরন্তর আত্মদংশনের যন্ত্রণা সইতে বাধ্য করা হচ্ছে না? তাদের প্রায়শ্চিত্তের সুযোগও আমরা রাখতে চাই না, চাই না তারা এসব চাপা গুমর প্রকাশ করে বিবেকের বোঝা লাঘব করুন। (সাইকিয়া, ২৮৬, হিস্টরি ওয়ার্কসপ জার্নাল)

৩. যশোরের হালিমা পারভীন : ১৯৭১ সালে হালিমা অষ্টম শ্রেণীতে পড়তেন। স্বপ্ন ছিল শিক্ষিত হয়ে বড় মানুষ হবেন। পাকিস্তানি বাহিনী তাদের বাড়ি জ্বালিয়ে দেয় এবং তার পিতাকে নির্মম প্রহার করে। এ দেখে হালিমার মনে প্রতিশোধ স্পৃহা জন্মায়। তিনি তার পরিবারের অন্যদের সঙ্গে অস্ত্র তুলে নেন। তারা ৩৫ জন তরুণ-তরুণীর একটি বাহিনী গড়ে তোলেন এবং ট্রেনিং নেন। হালিমা একাধিক অপারেশনে অংশ নেন এবং আর্মি ও রাজাকার হত্যা করেন। একটা পর্যায়ে স্থানীয় দালালরা খবর দিয়ে তাদের ধরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করে। তারা ঘেরাও হয়ে যান। কোনো প্রতিরোধ ছাড়াই ধরা দেন এজন্য যে, নইলে অনেক গ্রামবাসীও মারা পড়ত। তাদের যশোর ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে যাওয়া হয়। তার সামনেই সব পুরুষ যোদ্ধাকে হত্যা করা হয়। হালিমার সঙ্গে ধরা পড়েছিলেন ফাতেমা ও রোকেয়া নামের আরো দু'জন নারী যোদ্ধা। হালিমার ভাষায় : যশোর ক্যান্টনমেন্টে আমরা আরো হাজার হাজার নারীকে বন্দি থাকতে দেখি... তাদের ওপর যে অত্যাচার হয়েছিল তা আমি ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না। নিজ হাতে তাদের কবর খুঁড়তে হতো।... বাড়ি ফেরার পর আমি বুঝলাম আমার যুদ্ধ শেষ হয়নি। যদিও যশোর স্বাধীন হয়েছে কিন্তু আমি স্বাধীন হইনি। আমার যুদ্ধ যেন নতুন করে শুরু হলো। কিন্তু এবারের যুদ্ধ আমার নিজ মানুষদের সঙ্গে, আমার নিজের দেশের সঙ্গে যার জন্য আমি যুদ্ধ করেছি, যার জন্য আমি সব হারিয়েছি। আমার যুদ্ধ এখনো চলছে (ওমেন ইন ফ্রন্টাল ওয়ার : শাহীন আফরোজ, ২০০৫)। হালিমা মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে যুদ্ধের মধ্যে বন্দি হন। কিন্তু তার নাম মুক্তিযোদ্ধার তালিকায় ওঠে নাই, উঠেছে বীরাঙ্গনার খাতায়। এই ছিল তার পুরস্কার। হালিমা ছোটবেলায় চেয়েছিলেন ডাক্তার হয়ে মানুষের সেবা করতে। তার সাধ অর্ধেক পূরণ হয়েছে। তিনি ডাক্তার হতে পারেননি, অনেক কষ্টে সিভিল সার্জন অফিসের আয়া হতে পেরেছেন।

মধুমিতার কণ্ঠ আরো অনেক বাংলাদেশি মেয়ের মতো। সেই কণ্ঠ নির্যাতিতের কণ্ঠ। যোদ্ধা হওয়া বা দেশের জন্য ত্যাগ স্বীকারের গর্বের সঙ্গেই জড়িত হয়ে আছে তার সর্বনাশের ইতিহাস। পরিবারের ধর্ম এবং রাজনীতিই তাদের 'শত্রুশরীরে' পরিণত করেছে। পাকিস্তানি সৈন্য, বাঙালি রাজাকার এবং বিহারিরা দেশ ও জাতি রক্ষার নামে তাকে ধ্বংস করে দিয়েছে এবং ফেলে গেছে পুড়ে মরার জন্য। যখন সে পুকুর থেকে উঠে এলো, তখন তার গায়ের পোড়া মাংসের ঘ্রাণ কি আমাদের নাকে লেগেছিল? কিংবা তার যন্ত্রণা কি আমরা টের পেয়েছিলাম? আমরা তাকে ফেলে এসেছি দূর অতীতে– কখনোই না ফুরানো একাকিত্বের মধ্যে, যেখানে তার স্মৃতি, ভয়, উদ্বেগ অথবা আশার কোনো অংশীদার নেই।